

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই নির্মমতা কেন?

পুলিশ বল প্রয়োগ

আলী রীয়াজ

ঢাকার সাতটি কলেজের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ সমাবেশে গত বৃহস্পতিবার পুলিশের হামলা উদ্বেগের বিষয় অবশ্যই এই কারণে যে তাতে শিক্ষার্থীরা কেবল আহত হয়েছেন তা নয়, একজন শিক্ষার্থী এমনভাবে আহত হয়েছেন যে তাঁর চোখ হারাতে হবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে শিক্ষাসংক্রান্ত ন্যায় দাবি নিয়ে যখন শিক্ষার্থীরা পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন, তখন তাঁদের দাবির কারণ বোঝার চেষ্টা না করে তাঁদের ওপরে পুলিশ হামলা করেছে। তাঁদের দাবি ছিল অবিলম্বে রুটিনসহ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করার। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই সাতটি কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। এই কলেজগুলো হচ্ছে ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, কবি নজরুল ইসলাম কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও মিরপুর বালা কলেজ।

এই কলেজগুলো যেহেতু এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন, সেহেতু পরীক্ষার রুটিন ঘোষণার দায়িত্ব অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরেই বর্তায়। সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়ার যে আশঙ্কা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজ করছিল সেটা অমূলক নয়, কেননা দেশে এই ধরনের ঘটনা বিরল নয় যে পদ্ধতিগত কারণে অনেক কিছুই সময়মতো হয় না। ফলে শিক্ষার্থীরা চাইছিলেন যে আগে থেকেই যেন এই বিষয়ের একটা সুবাদ হয়। যে দেশে শিক্ষার্থীরা 'পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনের' কারণে সংবাদ হন, সেখানে এই ধরনের দাবিকে কোনো বিচারেই অসংগত বলা যাবে না। বরং এই ধরনের দাবিকে স্বাগত জানানোই হবে যথাযথ।

ঘটনার ব্যাপারে পুলিশের পক্ষ থেকে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেটাতে নতুন কিছু নেই। যথারীতি পুলিশ বলেছে যে নাগরিক দুর্ভোগ এড়াতে শিক্ষার্থীদের শাহবাগ এলাকা থেকে সরে যেতে বলার পরও তারা সরে না যাওয়ায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশের ভাষা হচ্ছে শাহবাগ মোড়ে রাস্তা বন্ধ করতে চাওয়ায় শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দেওয়া ও আটক করা হয়েছে। ঢাকায় যানজট এবং জলাবদ্ধতার কারণে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার উপায় নেই এ কথা সর্বজনবিদিত। ফলে তাতে আরও অন্য কিছু যুক্ত না হোক পুলিশ তা চাইতেই পারে, কিন্তু এই চতুরের দিনের পর দিন সমাবেশের ঘটনাই কেবল ঘটছে তা নয়, কয়েক মাস আগে এর কাছেই সরকার-সমর্থক ছাত্রসংগঠনের সমাবেশের কারণে সারা দিন শহর অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারি দলের অনুষ্ঠানের কথা না হয় বাদ দিলাম। এ ক্ষেত্রে কেন পুলিশের অতি-তৎপরতা তা আমরা বুঝতে পারি, যা বলা হচ্ছে সেটাই কারণ এমন মনে হওয়ার পক্ষে যুক্তি পাই না।

পুলিশের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল কি না, সেটা সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের প্রসঙ্গটি একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান জানলে এবং তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বরাতে জানালে এ ধরনের পরিস্থিতি হয়তো এড়ানো যেত। দ্বিতীয়ত, দাবিগুলোর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরাসরিভাবে যুক্ত, এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার্থী। ইতিমধ্যে যেহেতু এসব পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে বলে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের বলেছেন, সেহেতু এটি সমাধানের অযোগ্য বিষয় ছিল বলে মনে হয় না। আনুষ্ঠানিক লিখিতভাবে ঘোষণার পদক্ষেপ, যা শিক্ষার্থীরা দাবি করছিলেন, নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি পদ্ধতিগত কোনো বাধা থাকে তবে উপাচার্য এবং কর্তৃপক্ষ তাও ঘোষণা আকারেই বলতে পারতেন।

শিক্ষার্থীদের এ ধরনের বিষয়ে রাজপথের আশ্রয় নিতে হচ্ছে কেননা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ছাত্র সংসদ নেই। একসময় ছাত্র সংসদ না থাকাকে দুর্ভাগ্যজনক বলেই মনে হতো, এখন তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই বিবেচনা করতে হবে। কেননা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্বাচন এবং ছাত্র সংসদের অনুপস্থিতি আসলে একধরনের বিরাজনীতিকরণের লক্ষ্য নিয়েই বহাল রাখা হয়েছে। এতে করে ছাত্ররাজনীতির নামে কেবল যে সরকার-



শিক্ষার্থীদের দাবির কারণ বোঝার চেষ্টা না করে পুলিশ তাঁদের ওপরে হামলা করেছে

সমর্থক ছাত্রসংগঠনের উপস্থিতিই নিশ্চিত করা হচ্ছে তা নয়, এতে করে সরকারি ছাত্রসংগঠনের নামে এমন ধরনের সংগঠনের উদ্ভব ঘটেছে, যারা প্রায় প্রতিদিনই অভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দলে লিপ্ত আছে, তাদের নিজেদের ভেতরেও অর্ধ লাভের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এর বাইরে যেসব ছাত্রসংগঠন আছে, তাদের কার্যক্রমের জায়গাও সীমিত হয়ে গেছে। এর ফল কী হচ্ছে, সেটা সম্প্রতি তরুণদের ওপরে প্রথম আলোর উদ্যোগে পরিচালিত জরিপেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

দেখা যাচ্ছে যে জরিপে অংশ নেওয়া তরুণদের ৫১ দশমিক ২ শতাংশ রাজনীতি নিয়ে অনাগ্রহী। তরুণদের মধ্যে রাজনীতিবিমুখতা উদ্বেগজনক। জায়গায় উপনীত হয়েছে বলেই আমার ধারণা। কেননা, প্রচলিত রাজনীতির মধ্যে যদি তরুণেরা আস্থা না রাখতে পারে, তবে ভবিষ্যতে রাজনীতিতে কারা ভূমিকা রাখবে সেটা নিশ্চয় ভাবনার বিষয়। অন্য পক্ষে যারা প্রচলিত রাজনীতি থেকে বিমুখ তাদের কাছে কোন ধরনের আদর্শের আবেদন তৈরির সম্ভাবনা থাকে, তাও ভেবে দেখা দরকার। এটি বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা দরকার যে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক-পঞ্চমাংশের বেশি হচ্ছে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী, কোনো কোনো হিসাবে তা এক-চতুর্থাংশেরও বেশি। তদুপরি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরার তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৭১ লাখ নারী-পুরুষ আছেন, যারা স্থায়ী কাজের জন্য উপযোগী। কিন্তু তাঁরা কোনো কাজ করেন না। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি—৯ শতাংশ। এর মানে হলো স্নাতক কিংবা এর বেশি ডিগ্রিধারী প্রতি ১০০ জনে ৯ জন বেকার। বাংলাদেশে যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে তাকে অর্থনীতিবিদরা 'কর্মসংস্থানবিহীন প্রবৃদ্ধি' বলে চিহ্নিত করছেন। এসব তথ্য এই ইঙ্গিত দেয় যে রাজনীতি ও অর্থনীতি দুই ক্ষেত্রেই তরুণদের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি নিশ্চয় ইতিবাচক বলে বিবেচিত হতে পারে না।

ক্ষমতাসীনেরা সব সময়ই বিরাজনীতিকরণ ইতিবাচক বলে মনে করেন। তাতে তাঁদের সামনে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হবে না বলেই তাঁদের বিশ্বাস। স্বল্প মেয়াদে তার ফল ক্ষমতাসীনেরা ভোগ করেন, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে তার ফল হয় ভয়াবহ; তার ভার বইতে হয় গোটা দেশকে। এটি বোঝার জন্য

বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পড়ে দেখাই যথেষ্ট। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের বাইরেও তার অসংখ্য উদাহরণ আছে।

শিক্ষার্থীদের ওপরে এ ধরনের হামলার ঘটনা আবারও প্রমাণ করছে যে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলপ্রয়োগের বিষয়েই বেশি উৎসাহী। মনে রাখা দরকার যে দাবি পেশ, বিক্ষোভ করা এবং সমাবেশের অধিকার নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। সরকার-সমর্থিত না হলে যেকোনো ধরনের সমাবেশের ব্যাপারেই আমরা দেখতে পাই যে পুলিশ সেগুলোতে বাধা দেয় এবং সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের নাগরিক অধিকার পালনে বাধা দেয়, হেনস্তা করে। সম্প্রতি জাসদ নেতা আ স ম আবদুর রবের বাসায় পুলিশের উপস্থিতি এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে পুলিশের আচরণও প্রমাণ করে যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আইনের চেয়ে তাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে, সেটা প্রয়োগেই বেশি তৎপর। বলপ্রয়োগের এ ধারা ইতিমধ্যে একধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসনের আবহ তৈরি করেছে, স্বাভাবিক রাজনীতি ও মতপ্রকাশের পথগুলো অনেকেংশেই সীমিত রূপ লাভ করেছে। বলপ্রয়োগনির্ভর শাসনের ধারা অব্যাহত থাকলে বলপ্রয়োগের শক্তিই নীতি নির্ধারণের ভূমিকা লাভ করে।

বলপ্রয়োগের এ ধারা যে কতটা প্রবল এবং 'স্বাভাবিক' বলে বিবেচিত হচ্ছে তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হচ্ছে একজন সাংসদের উক্তি যেখানে তিনি প্রকাশ্যে পরিকল্পিতভাবেই আইনবহির্ভূত হত্যার সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতার কথা বলেছেন। গত ছয় মাসে যেখানে ৮৫ জন মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ৭৯ জন মারা গেছেন কথিত 'ক্রসফায়ার', সেখানে এ বিষয়ে কোনো স্বীকারোক্তিকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। কেবল দুঃখ প্রকাশই যথেষ্ট বলে ভাবার কোনো কারণ নেই।

কলেজশিক্ষার্থীদের ওপরে এ হামলা যেমন নতুন কোনো ঘটনা নয়, তেমনি এ ঘটনা যেসব বিষয়কে সামনে নিয়ে এসেছে সেগুলোও পুরোনো, কিন্তু এসব বিষয়ে নীরবতা পালন দেশ ও রাজনীতি উভয়ের জন্যই বিপদ ডেকে আনবে।

● আলী রীয়াজ: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের অধ্যাপক।